আমার ছবিকথা

ছবি নিয়ে দীপক কুমার নাথ তাঁর নিজস্ব ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলছেন এই বিভাগে।

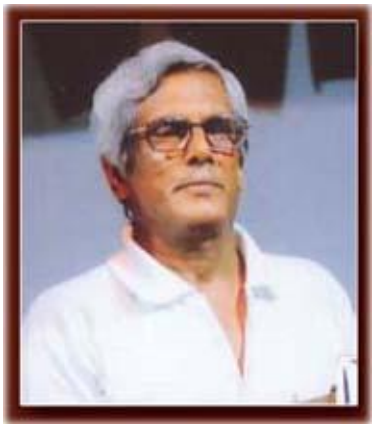

বিশ্রুত ল্যাণ্ডস্কেপ শিল্পী কনস্টেবলের বাবা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মিল মালিক। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে কনস্টেবলও তাঁদের পারিবারিক ব্যবসার কাজে যোগ দেবেন। কিন্তু তা ঘটেনি, লণ্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে গেলেন আঁকা শিখতে। পরিতোষ সেনের পিতা ছিলেন ঢাকার জিন্দাবাহার লেনের নামকরা কবিরাজ, তাঁর ছোট ছেলে পরিতোষ সেন হয়েছিলেন স্বনামধন্য শিল্পী ও শিল্প-শিক্ষক। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার বাবা ছিলেন ছা-পোষা সরকারী কর্মচারী। স্বভাবতই আমার কোন শিল্প-শিক্ষার ঝোঁক বা সুযোগ কোনটাই ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষার সময় গ্রামের স্কুলে পেনসিলে আঁকতে হত গ্লাস, ঘটি, পাতা, পদ্মফুল ইত্যাদি 'সিমেট্রি' নির্ভর ড্রইং। তারপর হায়ার সেকেন্ডারিতে ভূগোলের ম্যাপ, বিজ্ঞানের চোখ বা পাচনতন্ত্র কিংবা লেন্স বা বকযন্ত্র ইত্যাদির মধ্যেই ছিল আমার আঁকা-জোকা। নিজের বা বন্ধুদের (তখন বান্ধবী শব্দটা ছিল না) নতুন বইয়ের মলাটে সুন্দর করে নাম লেখার একটা নেশা ছিল যদিও 'ক্যালিগ্রাফি' শব্দটা তখনও জানতাম না – এগুলো বলছি সেই ৬০/৬২ সালের কথা। এইভাবে 'অক্ষর' লিখনের ব্যাপারটা পরবর্তীতে পোষ্টার লিখন পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল, অনেক পরে বহরমপুরে বি.এড করার সময় মাননীয় অধ্যাপক হর্ষ দাসগুপ্তের উৎসাহে আরও কিছু কাজ আঁকা-লেখা করেছিলাম। কলেজ জীবনে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের এক ছাত্রের সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে – তার সাথে বিভিন্ন জায়গায় যেতাম ছবি আঁকতে, কখনও গ্রামে, কখনও শিয়ালদা স্টেশনে আবার কখনও ধর্মতলার মিউজিয়ামে। গড়িয়া এন্ড্রুজ কলেজে পড়তাম, থাকতাম টালিগঞ্জে, ফলে সুযোগ ছিল গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, গগনেন্দ্র গ্যালারি বা অ্যাকাডেমিতে বিভিন্ন সময়ের প্রদর্শনীগুলো দেখার। ভিক্টোরিয়াতেও অনেক ছবি দেখেছি সেই সময়। বেশ কয়েকজন স্থানীয় শিল্পীর আঁকা ছবিও দেখতাম আগ্রহভরে, যদিও তাদের নাম এখন আর মনে নেই। কালক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, বয়সটা সত্তরের চৌকাঠ ছুঁয়েছে, আশাকরি পাঠকেরা নিজগুণেই ক্ষমা করবেন।

কলেজ জীবনেই ছবি আঁকার পরবর্তী পাঠের শুরু। আঁকার ব্যাপারে অনিয়ম ও আলস্যই আমার চিরসঙ্গী। তখন শুধু চাইনিজ কালিতেই ছবি আঁকতাম, কদাচিৎ রং দিয়ে, কারণ রং কেনার পয়সার অভাব ছিল। পাঁচভাইয়ের সার্বিক খরচের চাপ মা-বাবার মুখেই

ফুটে উঠতো। তারই মধ্যে এক সূত্র ধরে আমার আঁকা কয়েকটা জলরঙের ছবি নিয়ে চলে গেলাম শিল্পী পরিতোষ সেনের ফ্ল্যাটে – আমার আঁকা দেখে উৎসাহিত করলেন এবং তাঁর লেখা *জিন্দাবাহার* বই একখানা অটোগ্রাফ দিয়ে আমাকে উপহার দিলেন।

ইতিমধ্যে যোগাযোগ হয়েছিল বিজন চৌধুরী, ঈশা মহম্মদ, কাঞ্চন দাসগুপ্ত, সোমনাথ হোর, অজিত চক্রবর্তী প্রমুখের সাথে। না, অন্যকিছু নয়, আমি শুধু অবাক বিস্ময়ে উক্ত শিল্পীদের কাজ দেখতাম আর চাকুরীজীবনে যতটুকু সম্ভব দেশ-বিদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের ছবির বই কিনতাম আর নিয়মিত কলকাতার প্রদর্শনীগুলো দেখতাম প্রচুর সময় দিয়ে। মুশকিল হল এই যে, যত বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি দেখছি, ততই মনে আতঙ্ক ছড়াত যে এত সুন্দর সব ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছে হাজারো বছর ধরে, তাহলে নতুন করে আর কি আঁকবো? এক দোটানার মধ্যে দিয়ে চলেছি, তারই মধ্যে দু-এক জায়গায় আমার ছবির একক বা যৌথ প্রদর্শনীও হয়েছে দু-একটা। আসলে আমার অবস্থাটা অনেকটা সেই বাঁশ বাগানের ডোমকানার মতো। সব ভারতীয় প্রদর্শনীতে তখনই বেশ বিমূর্ত ছবির দেখা মিলত, রামকুমারের ছবির পাশে প্রকাশ কর্মকার, সতীশ গুজরালের পাশে বিনোদ বিহারী – বেশ একটা ধাঁধার মধ্যে চলছি, বুঝতে পারছি না যে আমি যা আঁকছি তা আদৌ *ছবি* কি না? যা কিছু ওই সব প্রদর্শনীতে দেখছি তাদের নিয়ে বেশ উত্তাল হচ্ছে মন, আর শুধু মনে হচ্ছে যে যা দেখছি তার কিছুই বুঝছি না। সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগেই কিছু বইপত্র কিনে পড়াশুনা শুরু করলাম। সাধন ভট্টাচার্য্যের *শিল্পতত্ত্ব পরিচয়* আমাকে অনেকটা সাহায্য করেছে। এছাড়া, বিনোদবিহারী, চিন্তামনি কর, অশোক মিত্র, পরিতোষ সেন প্রমুখ লেখকের পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী* কিংবা *শিল্প ও দেহতত্ত্ব* প্রবন্ধ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।

ছবির ফর্ম ও কন্টেন্ট বিষয়ক পাঠগুলো যদিও আমাকে কিছুটা দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলেছে, তবুও কিছুটা আত্মবিশ্বাসও উঁকি মারছে যে কিছু বিষয় আগের চেয়ে স্বচ্ছ হয়ে আসছে। ইম্প্রেসনিস্ট, কিউবিস্ট, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ইত্যাদি থেকে পোষ্ট মর্ডানিস্ট পর্যন্ত পরিক্রমা অনবরতই আমার ভিতরটা রক্তাক্ত করছে, যদিও কনস্টেবলের নিসর্গ দৃশ্যের সাথে গোপাল ঘোষের ছবি কিংবা রদাঁর ভাস্কর্যের পাশে হেনরি মূর এখন আমাকে আর ধাঁধায় ফেলছে না। জ্যাকসন পোলকের ছবি *ল্যাভেন্ডার মিস্ট*-এর সঙ্গে সহজেই মনে পড়ে মোনের *লন্ডন ফগ* । এটুকুই আমার অর্জন।

মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর সঙ্গে সালভাদোর দালির তুলনা করা যায় কি না আবার ক্যালডারের ভাসমান বা উড়ন্ত ভাস্কর্য কে কি উত্তর আধুনিক বলা হবে? এইরকম হাজারো প্রশ্ন বা সংশয়ের মধ্যেই ধীর গতিতে কিছু ছবি এঁকেছি। মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট শিল্পী-শিক্ষক পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়ের সাথে কিছুদিন যোগাযোগ ছিল, সেই সূত্রে তাঁর কাছেও কিছু শিখেছিলাম। বিশেষত, তেলরঙের ব্যবহার সম্বন্ধে – কিন্তু ওই যে আমার রোগ, ধারাবাহিকতার অভাব, তাই আসলে কিছুই শেখা হয়ে উঠলো না – আমি থেকে গেলাম আমাতেই। ১৯৭৮ থেকে ২০০০ সাল এই পর্বেই কিছু ছবি এঁকেছিলাম কখনও পড়াশুনার তাগিদে, যেমন বি.এডে ইংরাজী মেথড থাকার সূত্রে আঁকলাম এক ছবি *দি সলিটারি রিপার* কিংবা রবীন্দ্র মেলা সূত্রে *ওরা কাজ করে* ... কারো অনুরোধে (পড়ুন, উপহার হিসাবে) আঁকা ছবিগুলি সবই এখন অপরের হাতে। জলরং, প্যাস্টেল, তেলরং – এই তিন রকমেই কিছু ছবি আমার নিজ সংগ্রহে আছে। জলরঙের কিছু ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। এইসব থেকেই বেছে নিয়ে আমার কন্যা সুবর্ণার উদ্যোগে *গ্যালারি উদ্ভাসে* প্রদর্শনী হয়ে গেল গত ২০-২৭ ফেব্রুয়ারী।

মোদ্দাকথা এই যে, এই ইনিংসে আর বেশী কিছু হবার নেই। যে নিবিষ্টতা, ধারাবাহিকতা ও ডেডিকেশন শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন তার নিতান্তই অভাব, বরং আমি অবসর সময়ে জানার চেষ্টা করে যাচ্ছি শিল্পের স্বরূপ কি? আদিকাল থেকে (ভারতের নাট্যশাস্ত্র) আধুনিক যুগ পর্যন্ত (*হোয়াট ইজ আর্ট* – টলস্টয়) বা ইদানিং পোস্টমর্ডানিস্ট আন্দোলন পর্যন্ত শিল্প-সাধনার ইতিহাস অনুধাবনের চেষ্টা করছি, আর এতেই পাচ্ছি একটা অনাবিল আনন্দ। রবীন্দ্রনাথও বুড়ো বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেন, ফিদা হুসেন ছবি এঁকে শতাব্দীর সাক্ষ্য বহন করেন, টার্নারের অঙ্কন পাহাড়ী ঝড়কে উস্কে দেয়, সোমনাথ হোর ভাঙা ল্যাম্পপোষ্টে ছেনি হাতুড়ি মেরে ভাতৃস্নেহ ফুটিয়ে তোলেন, জয়নুল আবেদিন, চিত্তপ্রসাদ, গোবর্ধন আশ মানবাত্মার জীবন যন্ত্রনা প্রকাশ করেন। পিকাসোর *গোয়ের্নিকা* হিংসার বিরুদ্ধে এক অনবদ্য অভিযান, ভ্যান গঘের সূর্যমুখী আজও ফোটে, গগ্যাঁর তাহিতি দ্বীপের সুন্দরীদের ছবিতে চড়া রঙের গন্ধ আমার নাকে পৌঁছায়, মুগ্ধ করে শাহাবুদ্দিনের তুলির বিদ্যুৎগতি। পাশাপাশি আনন্দ পাই ক্রিস্টো জাবাশেফের অভূতপূর্ব সৃষ্টি *ঘেরা দ্বীপ* – মায়ামির কাছে বিসকেন খাঁড়িতে ১১টা দ্বীপকে নিয়ে একটা – কি বলবো? ছবি? ভাস্কর্য? না স্থাপত্য? জানিনা, তবু ভাল লাগে ৩২ লাখ ডলারের এই অনুপম অস্থায়ী রচনা যা শুধু

বেঁচে আছে এবং থাকবে মাত্র চিন্তনে। অনুরূপ জুডি শিকাগো রচনা করেছেন *সান্ধ্যভোজের আসর* – সেখানে আছে বিশ্বের বরেণ্য মহিলাদের প্রতি শিকাগোর শ্রদ্ধার্ঘ্য : মার্কিন মুলুকের এ দুটি 'উত্তর আধুনিক' শিল্পকর্ম যদিও আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে মেলে না, তবুও বলবো সেই কবিগুরুর ভাষাতেই – আমার ছবিজীবনের মূল কথা : 'আমি যা পারিনি দিতে, নিত্য আমি / থাকি তার খোঁজে।'

তবু কিছু কথা বাকী থেকে যায়, সেটা হচ্ছে যে আমার ভাললাগা শিল্পীদের জন্য কয়েকটা লাইন আমায় লিখতেই হবে, কিন্তু অতি সংক্ষেপে, কারণ অসংখ্য বরেণ্য শিল্পীদের মধ্যে থেকে বাছাই করা আমার কর্ম নয়। শুধু যাদের ছবি দেখেছি বা ছবির ছবি দেখেছি তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করবো, দেশের এবং বিদেশেরও। এককথা বলতে গেলে রামকিঙ্করের ভাস্কর্য এবং ছবি, দুটোই আমাকে নাড়া দেয়। হরেন দাসের উডকাট্ মনে করায় বাসুদেব রায়ের কথা। পরেশ মাইতির রঙের স্বচ্ছতা যেন বিশুদ্ধ জলকেও হারমানায়। বিকাশ ভট্টাচার্যের আঁকা প্রতিটা মানুষের চোখ যেন দর্শকের অন্তরে ছায়া ফেলে। শ্যামল দত্তরায়ের ছবির মধ্যে একটা অ্যান্টিকের আভাস। রবীন মন্ডল, গনেশ পাইন, গনেশ হালুই প্রত্যেকের ছবিই বহুদিন মনে থাকবে। পুর্ণেন্দু পত্রীর বলিষ্ঠ রেখা মনেও দাগ কেটে যায়। চিত্রভানু তাঁর ছবিতে যেভাবে সাদাকে ব্যবহার করেছেন তা এক কথায় অপূর্ব। তৈয়েব মেহতার অঙ্কণ শৈলী সম্পূর্ণ এক পৃথক ঘরাণা। অমৃতা শেরগিলের অঙ্কণে *নারী* আপনা মহিমায় উদ্ভাসিত। ওয়াসিম কাপুরের মুকুট মাথায় কাকতাড়ুয়া দর্শককে মনে রাখতেই হবে। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি চিনতে কারো কষ্ট হবে না কোনদিনই।

আধুনিক থেকে উত্তরাধুনিকের গতিপথে পাশ্চাত্যের যেসব শিল্পীকে আমার ভাল লেগেছে, তাঁদের মধ্যে জর্জিয়া ওকিফে এবং জুলিয়ান আয়ার্স অন্যতম। পল ক্লী, মন্দ্রিয়ান, মিরো থেকে কান্দিনিস্কী পর্যন্ত মহান শিল্পীদের ছবি বহু কালাতীত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল, সময়ের দাবী ওঁরা মেনেছেন নাকি সময় ওনাদের কাজকে আত্মস্থ করেছে – এ বিতর্ক পণ্ডিতদের জন্য তোলা থাক। একজন আহত দর্শক হিসাবে মন্তব্যের দুঃসাহস সঙ্গতভাবেই আমার অন্ততঃ নেই। মোটামুটি এখানেই শেষ আমার ছবি জীবনের ইতিকথার। কবির ভাষায়: 'দিনদিন আয়ুহীন, হীনবল দিনদিন, তবু এ আশার নেশা মিটিল না'। না, আমার জানার আকাঙ্খা যেন না মেটে – এই কামনা করেই আমার লেখার সমাপ্তি।

চিত্র পরিচয় : শিল্পীর ফোটোগ্রাফ এবং শিল্পীর আঁকা বেশকিছু ছবি।